ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স

লেখক

কবির আনোয়ার
মুজাহিদ রাসেল

ভাষা-সম্পাদনা

জাকারিয়া মাসুদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

উৎসর্গ

প্রতিটি যুগের সকল সীরাত লেখকদের, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল প্রিয় রাসূল ﷺ-এর কাঠামোবদ্ধ জীবনী। যাদের কাজের ওপর ভর করে কেয়ামত অবধি এ মহামানবকে নিয়ে গবেষণা চলবে, খুলবে নতুন দিগন্ত...

বিষয়সূচি

শুরুর আগে ১১

Itqaan Institute : **পথচলা ও আগামীর স্বপ্ন** ১৪

ভূমিকা ১৬

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ২০

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের আবির্ভাব ও ক্রম বিবর্তন ২৩

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের উপাদানসমূহ ২৬

পেশাগত এবং পারিবারিক জীবনে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ৩১

১. কর্ম ও পেশাগত জীবনে ৩১

২. পারিবারিক জীবনে ৩১

আবেগ ও বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা ৩৩

স্পিরিচুয়াল ইন্টেলিজেন্স বা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তা ৩৭

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের নেতিবাচকতা ৪১

Self-awareness **(আত্মসচেতনতা)** ৪৪

১. 'আত্মসচেতনতা' কিভাবে অর্জন করা যায়? ৪৫

২. আত্মসচেতনতার ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ৪৮

৩. মূসা ﷺ-এর আত্মসচেতনতা ৫১

৪. আত্মসচেতনতা ও আত্মশুদ্ধি ৫১
৫. কুরআন যেভাবে আত্মসচেতনতা শেখায় ৫৩
৬. হাদীসের আলোকে আত্মসচেতনতা ৫৯
৭. আত্মসচেতনতা ও রাসূল ﷺ-এর একটি অসাধারণ দুআ ৬০
৮. আত্মসচেতনতার চেকলিস্ট ৬১

আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মব্যবস্থাপনা ৬৫

১. আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের উপায় ৬৬
ক. ইতিবাচকতা (Positivity) ৬৬
খ. উন্নত মানসিকতা (Growth mindset) ৬৮
গ. ধকল কাটিয়ে ওঠা (Stress Management) ৭৩
ধকল কাটানোর ইসলামি নির্দেশনা ৭৪
ঘ. সবর (Patience) ৮২
ঙ . আত্মবিশ্বাস (Self-confidence) ৮৭
২. আত্মনিয়ন্ত্রণের ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ৯২
ক. কুরআন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ৯৪
খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধি ৯৬
গ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেখানো পন্থা ৯৭
৩. আত্ম-নিয়ন্ত্রণের চেকলিস্ট ১০৩

সহমর্মিতা (Empathy) ১০৬

১. Sympathy ও Empathy এর মধ্যে পার্থক্য ১০৬
২. কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে সহমর্মিতা ১০৭
৩. সহমর্মী হব কেন? ১১০
৪. সহমর্মী হব কিভাবে? ১১১
ক. নিজেকে অন্যের অবস্থানে ভেবে দেখুন ১১১
খ. অন্যের প্রতি আন্তরিক হোন এবং মন দিয়ে অন্যের কথা শুনুন ১১২
গ. বক্তাকে প্রশ্ন করুন ১১৩
ঘ. Mirroring: ১১৩
ঙ. আলাপ শেষ করার জন্যে তাড়াহুড়া করবেন না ১১৪
চ. মানুষের অনুভূতির মূল্যায়ন করুন ১১৭
ছ. দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবেন না ১২২
জ. সহযোগী হন, প্রতিপক্ষ হবে না ১২২

ঝ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পারিবারিক প্রেক্ষাপটের কথা বিবেচনা করে কথা বলুন ১২৪
ঞ. অন্যকে ছাড় দিতে চেষ্টা করা ১২৫
৫. সহমর্মিতার চেকলিস্ট ১২৬

আত্ম-অনুপ্রেরণা বা স্ব-প্রণোদনা ১২৯

১. স্ব-প্রণোদিত (Self-motivated) হওয়া যায় কিভাবে ১৩৯
ক. নিজেকে বা অন্যকে অনুপ্রাণিত করার আগে নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার হয়ে নেওয়া জরুরি ১৩৯
খ. সেলফ-মোটিভেটেড থাকার জন্য অপরকে মোটিভেট করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ ১৪০
গ. সেলফ মোটিভেশনের আরোকিছু গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়াদি হলো- ১৪০
২. সেলফ-মোটিভেটেড মানুষেরা সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে ১৪২
৩. রাসূলগণের Self-motivation : কুরআন কী বলে? ১৪২
৪. রাসূল ﷺ এর জীবন থেকে সেলফ মোটিভেশনের শিক্ষা ১৪৬
৫. আত্ম-অনুপ্রেরণার চেকলিস্ট ১৪৮

সামাজিক দক্ষতা ১৫১

১. সামাজিক দক্ষতার আনুষঙ্গিক গুণগুলি কিভাবে অর্জন করা যায় ১৫২
২. সামাজিক দক্ষতার ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ১৫৩
৩. ইয়াকুব ﷺ এর সামাজিক দক্ষতা ১৫৫
৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামাজিক দক্ষতা ১৫৬
৫. সামাজিক দক্ষতার চেকলিস্ট ১৬৪

শেষ কথা ১৬৭

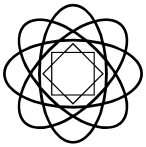

শুরুর আগে

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবারের ওপর এবং তাঁর সাহাবিয়ে কেরামের ওপর।

যখন থেকে ইসলাম সম্পর্কে টুকটাক জানার চেষ্টা শুরু করেছি এবং ইসলামের দিক নির্দেশনা ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগ করার গুরুত্বটা বুঝেছি তখন থেকেই নবি ﷺ-এর জীবনী জানার এক প্রবল আগ্রহ কাজ করত। এই জানা মানে শুধু 'ভাসা ভাসা পড়া' নয়, বরং এই অসাধারণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির পূর্ণাংগ জীবনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার চেষ্টা করতাম সুযোগ পেলেই। নবি ﷺ-এর জীবনীর অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হলো- আপনি যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে চাইবেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে তাঁর জীবনী পড়লে অবশ্যই উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা পেয়ে যাবেন। নবি ﷺ-এর জীবনী পড়ার ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতাম তা হলো- তাঁর ম্যানেজারিয়াল ও লীডারশিপ স্কিলের প্রয়োগ। অর্থাৎ তিনি কিভাবে অন্যদের সাথে যথোপযুক্ত কমিউনিকেট করতেন, কিভাবে নেগোশিয়েট করতেন, কিভাবে সাহাবিয়ে কেরামকে নের্তৃত্ব দিতেন, কিভাবে সকল ব্যস্ততা সামলে পরিবারের জন্য টাইম ম্যানেজ করতেন ইত্যাদি সীরাত থেকে বোঝার চেষ্টা করতাম। নবি ﷺ-এর এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ সফট স্কিল ছিল ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। বর্তমান কর্পোরেট দুনিয়ায় যে ক'টি সফট স্কিল নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় উঠছে সেগুলোর মধ্যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স অন্যতম।

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের দৃষ্টিতে সীরাতের দিকে তাকালে যে কেউ অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করবেন যে, সমকালীন বিশেষজ্ঞগণ যা এখন তাত্ত্বিকভাবে বলছেন সেগুলোই, কিছু ক্ষেত্রে বরং তার চেয়েও কম্প্রিহেনসিভ ধারণা নবিজি তাঁর জীবনে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন এবং শিখিয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সফট

স্কিলটির ব্যাপারে সমকালীন বিশেষজ্ঞদের মতবাদ ও নবি ﷺ-এর দেখানো দিক-নির্দেশনাকে সমন্বয় করার জন্য আমরা ভেতর থেকে তীব্র তাগাদা অনুভব করি। এর ফলে কর্পোরেট জগতের কাছে যেমন নবি ﷺ-এর শিক্ষার একটি অংশ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, তেমনি মুসলিম পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, কর্মজীবিসহ সকল শ্রেণীর মুসলিমদের কাছেও নবি ﷺ-এর এক গুরুত্বপূর্ণ অথচ সমকালীন সময়ে উপেক্ষিত শিক্ষাকে তুলে ধরা সম্ভব হবে। সেই সাথে কর্পোরেট ট্রেনিং ও কোচিং নিয়ে যেসকল মুসলিম ভাইয়েরা কাজ করছেন তারাও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সকে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপনের খোরাক পাবেন।

এই উদ্দেশ্যগুলিকে মাথায় রেখেই শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও রোকন ভাইয়ের আন্তরিকতা ও উৎসাহে আমরা বইটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিই। আল্লাহ রোকন ভাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বোন শারিকা হাসান এর প্রতি-যার আন্তরিক সহযোগীতায় কাজটি দ্রুততর হয়েছে। এছাড়াও বোন সানজিদা শারমিন, আঞ্জুম ইসমাইল এবং ফাহমিদা হোসাইন এর সহযোগীতাও আমরা আন্তরিকভাবে স্মরণ করছি। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দিন।

বইটিতে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের পাঁচটি উপাদানের প্রতিটি নিয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে একটি চেকলিস্ট দেওয়া আছে। প্রতিটি উপাদান সম্পর্কে পড়ার পরপরই চেকলিস্ট পূরণ করে নিজের অবস্থা যাচাই করে নেওয়ার আন্তরিক অনুরোধ থাকবে। মনে রাখতে হবে- এটি কোনো বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত টেস্ট নয়, তবে এই টেস্টের ফলাফল থেকে একজন মানুষ নিজের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের লেভেল সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন এবং এর ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আত্মউন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে পারেন। চেকলিস্টে হাদিসের রেফারেন্স নম্বরগুলো https://sunnah.com/ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আমাদের জানামতে, বাংলা ভাষায় ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের ওপর এটিই প্রথম স্বতন্ত্র বই। আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা ছিল যথাসম্ভব বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার। তবে আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। যেকোনো সংশোধনী, পরামর্শ ও মতামত খোলামনে জানানোর অনুরোধ থাকল। ইন শা আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করে নিব। সেই সাথে পাঠকের কাছে থাকল দুআর দরখাস্ত। আল্লাহ যেন এই কাজটিকে কবুল করে নেন, যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেন, হাশরের মাঠে এই কাজটিকে আমাদের মিজানের পাল্লায় যুক্ত করে দেন এবং নবি ﷺ-এর জীবনের এক অনবদ্য শিক্ষাকে লিখনীতে তুলে ধরার ওসীলায়

আল্লাহ যেন নবি ﷺ-এর শাফায়াত আমাদের জন্য মঞ্জুর করে দেন। আমীন ইয়া রব্বাল ‘আলামীন।

মা’আসসালামাহ।

কবির আনোয়ার
মুজাহিদ রাসেল

alfazr89@gmail.com
muzahidrasel@gmail.com

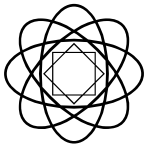

Itqaan Institute : পথচলা ও আগামীর স্বপ্ন

মুসলিম হিসেবে আমরা জানি ও মানি যে, আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নবি ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণীয়। নবি ﷺ-এর জীবন থেকে আকীদা-ইবাদাত-মুআমালাত ও আখলাক শেখা যেমন মুসলিমদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেমনি পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাঁর দেখানো পথে হাঁটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ওপরন্তু নবি ﷺ-এর চর্চিত **ম্যানেজারিয়াল ও লীডারশিপ স্কিল** থেকে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হতে পারে। পাশাপাশি আমাদের অমুসলিম ভাই-বোন এবং কর্পোরেট জগতের কাছে নবি ﷺ-এর শিক্ষার সারমর্ম তুলে ধরার জন্যও নবি ﷺ-এর সফট স্কিলগুলি নিয়ে বেশি বেশি কাজ হওয়া প্রয়োজন। এই চিন্তাকে মাথায় রেখে Itqaan Institute যাত্রা শুরু করে।

যেহেতু Itqaan Institute এর কাজের মূল ভিত্তি নবি ﷺ-এর পবিত্র জীবন তথা সীরাতে নববি, তাই তাঁর তথ্য ও ঘটনাবহুল, বৈচিত্র্যময় ও পবিত্র জীবনীকে মানুষের সামনে প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করা, তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে কাঙ্ক্ষিত স্তরে নিয়ে যাওয়া এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের প্রেরণা উম্মাহর মধ্যে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে Itqaan Institute আয়োজন করে ২ সেমিস্টারে বিভক্ত ১ বছরব্যাপী ৮১টি লাইভ ক্লাস সম্বলিত সীরাত এক্সটেন্সিভ কোর্স। একে Itqaan Institute এর 'সিগনেচার কোর্স' বললে ভুল হবে না। এই কোর্সটিতে ১০০০+ পৃষ্ঠার নিজস্ব ক্লাস নোট দেওয়া হয়। এই কোর্সটি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে চেনা ও জানার ব্যাপারে এক নতুন ভাবনার উন্মেষ ঘটাবে আমাদের মাঝে, ইন শা আল্লাহ।

আমরা সকলেই জানি, একবিংশ শতাব্দীতে স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে চারপাশে যেন

আলোচনার ঝড় বইছে। অথচ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানুষের কল্যাণকে সামনে রেখে সেগুলো কিভাবে প্রয়োগ করে সত্যিকার আত্ম-উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে সীরাতে নববিতে। তাই সীরাতের দর্পণে সমকালীন সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় স্কিলগুলি (পেশাগত ও ব্যক্তিগত) মানুষের সামনে তুলে ধরার স্বপ্ন দেখে Itqaan Institute. এই স্বপ্নকে মাথায় রেখেই **প্রতিনিয়ত নতুন নতুন একাডেমিক কোর্স আয়োজন করে যাচ্ছে তারা।** আগামীতেও ইসলামিক ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক পৃথক কোর্স আয়োজন করা হবে, সেই সাথে মুসলিমদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় স্কিলগুলি নিয়ে থাকবে বিশেষ আয়োজন, ইন শা আল্লাহ।

Emotional Intelligence: The Prophetic Guideline কোর্সটির দুইটি ব্যাচ ইতিমধ্যে সফলভাবে শেষ হয়েছে। সামনেও নতুন ব্যাচ শুরু হবে ইন শা আল্লাহ। কোর্সটিতে আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাদেরকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। কোর্সটিতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য নিচে দেওয়া লিংক থেকে Itqaan Institute এর ফেসবুক পেইজে নক দিন। দুআর দরখাস্ত।

Itqaan Institute এর ফেসবুক পেজ থেকে ঘুরে আসুন এই লিংকে : shorturl.at/bABHN

Itqaan Institute এর ওয়েবসাইট এ যেতে: https://itqaan.org/

Itqaan Institute এর ইউটিউব চ্যানেল এখানে: shorturl.at/lnsu6

Itqaan Institute এর কোর্সগুলি সম্পর্কে জানতে: shorturl.at/beglU

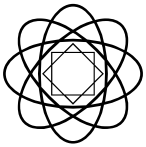

ভূমিকা

আল্লাহর রাসূল একবার তাঁর সাহাবিদের সাথে এক মজলিসে বসে ছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলেন। এসময় একজন কৃষ্ণকায়, বাহ্যিকভাবে অসুন্দর একজন লোক এসে রাসূল ﷺ-এর প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যেমন আপনি দেখছেন আমি একজন বিশ্রী এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। লোকজন আমাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমার মতো কুৎসিত কালো মানুষও কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে?"

ভাবা যায়, হীনমন্যতার জটিলতা কোন লেভেলে আচ্ছন্ন করলে কোনো মানুষ এভাবে চিন্তা করতে পারে!

আল্লাহর রাসূল ﷺ তার অন্তরের ব্যথা বুঝতে পারলেন। তার কষ্টটাকে উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি তার এ প্রশ্নকে কটাক্ষ করেননি। উপহাস করে উড়িয়ে দেননি। কিংবা কথাচ্ছলে তাকে এড়িয়েও যাননি। রাসূল ﷺ-এর তাঁর দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালেন। দয়ার নবির দয়ার সাগরে প্রবল ঢেউ খেলে গেল। অত্যন্ত ভালোবাসা নিয়ে তিনি বললেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে সেই সত্তার শপথ করে বলছি, তোমাকে এই চেহারা এবং কৃষ্ণশরীর অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেবে না। জান্নাতের জন্য একমাত্র শর্ত হলো আল্লাহকে ভয় করা এবং আমার রিসালাতের ওপর ঈমান আনা।"আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর কথা শুনে ওই লোকটি এত্ত খুশি হলো যে, সাথে সাথে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিল। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন,"আমার কী কী অধিকার আছে?"

রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন,"অন্য মুসলমানের যে যে অধিকার আছে সেই সেই অধিকার তোমারও রয়েছে এবং তোমার ওপর সেই সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে,

যা অন্যান্য মুসলমানের আছে এবং তুমি তাদের ভাই।"[১]

একজন মানুষের সাইকোলজি চিন্তা করে তার সাথে আচরণ করা, ভাবের আদান-প্রদান করা এবং একটা সম্পর্ক তৈরি করা ছিল রাসূল ﷺ-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটা অংশ। আরেকটি উদাহরণ দিই। এ ঘটনাটি বহুল প্রচারিত। মানুষের মানবিক সংস্কারের পন্থা এবং উদাহরণ হিসেবে এই ঘটনাটি মাইলফলক হয়ে আছে।

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক কুরাইশ যুবক ব্যভিচারের অনুমতি প্রার্থনা করে। সামনে উপস্থিত সাহাবিরা রাসূল ﷺ-এর সামনে এমন অশোভন উক্তি ভালোভাবে নিতে পারেননি। তাঁরা রেগেমেগে সে যুবককে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি শান্তচিত্তে যুবকটিকে তাঁর কাছে আসতে বললেন। অতঃপর তাকে পরম মমতায় একজন শুভাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকসুলভ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন :-তুমি কি তোমার মায়ের জন্যে এটা (ব্যভিচার) মেনে নেবে?

যুবক জবাব দিল- 'না।'তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি কিভাবে আশা করো, অন্য লোকেরাও এটা তাদের জন্য অনুমোদন করবে!

- অতঃপর তিনি আবার যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এটা (ব্যভিচার) তোমার কন্যা, বোন ও চাচির জন্য অনুমোদন করবে?

এবারও যুবক জবাব দিল- 'না।'রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, তাহলে তুমি কিভাবে আশা করো, অন্য লোকেরাও এটা তাদের জন্য অনুমোদন করবে!

অতঃপর প্রিয়নবি ﷺ যুবকটির হাত ধরে আল্লাহর দরবারে পাপ মোচনের দুআ করলেন। আল্লাহর কাছে আরও ফরিয়াদ করলেন 'হে আল্লাহ! আপনি তার অন্তর পবিত্র করুন এবং (এই অবৈধ কামনার বিরুদ্ধে) তাকে সহিষ্ণু করুন।'

সাহাবিগণ বলেন, এরপর থেকে ওই যুবক কোনোদিন অন্যায়ের দিকে পা বাড়ায়নি।'[২] সীরাত থেকে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করি, যা আপনাকে সবকিছু বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবতে বাধ্য করবে। অতঃপর বুঝতে পারবেন মানুষের সাথে রাসূল ﷺ-এর আচরণ আসলে কেমন ছিল।

সম্পর্কে আবু লাহাব ছিল রাসূল ﷺ-এর চাচা এবং চরম মাত্রায় ইসলাম-বিরোধী। তাকে এবং তার স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে কুরআনে সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। সেই আবু লাহাবের মেয়ে, রাসূল ﷺ-এর চাচাতো বোন 'দুররা' ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায়

[১] উসদুল গাবাহ : ২/৪১৮
[২] মুসনাদে আহমাদ : ২২২১১

হিজরত করেন। দাহিয়াতুল কালবী ﵁ নামের প্রখ্যাত সাহাবির সাথে তাঁর বিয়ে হয়। দাহিয়াতুল কালবী সম্পদশালী এবং সুদর্শন সাহাবি ছিলেন। জিবরাঈল ﵇ বেশিরভাগ তাঁর সুরত ধরেই রাসূল ﷺ-এর কাছে ওহী নিয়ে আসেন।

যাই হোক, মদীনায় কিছু জ্ঞানহীন দুররা ﵂-কে কথায় কথায় খোঁচা দেওয়া শুরু করল। কেউ কেউ তাঁকে এমনও বলত যে, 'তোমার হিজরতের আর কী মূল্য আছে! তুমি না আবু লাহাবের মেয়ে।' মহিলারা তো বলতই একবার এক পুরুষও তাঁকে এমন ধরনের কথা বলল। আপনি চিন্তা করতে পারেন—একজন সন্তানের জন্য এটা কত বেশি মানসিক পীড়াদায়ক! সন্তান যে রবের একনিষ্ঠ ইবাদাতকারী সেই রব আপন জন্মদাতা পিতাকে সমালোচনা করে এবং শাসিয়ে বক্তব্য পাঠিয়েছেন এবং তার অনুসারী মুসলিমরা সেটা সকাল বিকাল পাঠ করে। "একের বোঝা অন্যে বহন করবে না" কুরআনের এমন বক্তব্য দুররা ﵂-কে ক্ষতে মলমের মতো কাজ করলেও মানুষের আড়কথা তাকে বেশ মানসিক যন্ত্রণায় ভোগাতে শুরু করল।

বিষয়টি রাসূল ﷺ-এর কাছে গেলে তিনি মাসজিদে এসে এটার জন্য বিশেষভাবে একটা বক্তব্য দেন। তিনি কাফির আত্মীয়স্বজনদের জন্য মুসলিমদের কষ্ট দিতে নিষেধ করেন। (আলইসাবাহ, পৃষ্ঠা : ১২৭)

একদিন দুররা ﵂ রাসূল ﷺ-এর বাড়িতে এসে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ﵂-এর সাথে গল্প করছিলেন। এ সময় রাসূল ﷺ বাহির থেকে এসে ওযু করার জন্য পানি চাইলে দুজনই তড়িঘড়ি করে রাসূল ﷺ-এর পানি দেওয়ার জন্য এগিয়ে গেলেন। দুররা ﵂ আগে পানির পাত্র রাসূল ﷺ-এর এগিয়ে দিলেন। তাঁকে দেখে মানুষের সমালোচনার কথা মনে পড়ে গেল। নবিজি তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন—"তুমি আমার অংশ এবং আমি তোমার অংশ।"[৩]

আরবীতে এ কথার মানে দাঁড়ায়—"তোমার-আমার শরীরে একই রক্তধারা বইছে।"রাসূল ﷺ জনসমক্ষে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে দুররা ﵂-কে কিভাবে সহমর্মিতা দেখিয়েছে সেটার পার্থক্য সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন। সাথে সাথে রাসূল ﷺ তাঁর অনুসারীদের আবেগ (Emotion) কত গভীরভাবে বুঝতেন, তার ধারণা পাওয়া যায়।

আরেকটি ঘটনা এখানে না বললেই নয়। উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা ﵂ ছিলেন একজন ইয়াহূদি রাজার মেয়ে। নবি ﷺ-এর ঘরে স্ত্রী হয়ে আসার পর কোনো এক উম্মুল

[৩] মুসনাদে আহমাদ : ২৪৩৮৭

মুমিনীন তাঁকে 'ইয়াহূদির মেয়ে' বলে তিরস্কার করেছিলেন। নবিজি ঘরে এসে দেখলেন সাফিয়্যা ﵂-এর মন খারাপ। তিনি এর কারণ জানতে পেরে বললেন, "তাকে বলে দিও—তোমার বাবা একজন নবি (এখানে নবি বলতে মূসা ﵇-কে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু সাফিয়্যা বানী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত ছিলেন), তোমার চাচা একজন নবি (হারূন ﵇) এবং তোমার স্বামীও একজন নবি।" একথা শুনে সাফিয়্যা ﵂ খুশিতে আটখানা হয়ে গেলেন। (সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯২)

এই যে রাসূল ﷺ—মানুষের মন, মনন, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা চিন্তা করে কথা বলছেন, তাদেরকে কাছে টেনে নিচ্ছেন, তাদের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করছেন এই গুণটিকে আমরা আসলে কিভাবে চিহ্নিত করতে পারি? আপনি যদি সীরাত-গ্রন্থের মনোযোগী পাঠক হন, আমি নিশ্চিত, এই মুহূর্তে এমন ঘটনার অসংখ্য উদাহরণ আপনার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আধুনিক দুনিয়ায় এ গুণটিকে 'ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স' বা নামে ডাকা হয়। বাংলায় একে 'অনুভূতির ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা' বা 'বিচক্ষণ অনুভূতি' বলা যায়। চলুন, এর বিস্তারিত পরিচয় ও ইতিবৃত্ত জেনে আসা যাক।

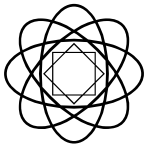

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স

বর্তমান বিশ্বের এক বহুল আলোচিত শব্দ। আজকের কর্পোরেট দুনিয়া থেকে শুরু করে প্রতিটি সেক্টরে এর ব্যাপক জয়জয়কার। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতার সোপান বলা হচ্ছে এই ধারণাকে। অনেকে আগবাড়িয়ে জ্ঞান এবং মেধার আগে একে স্থান দিতে মরিয়া হয়ে গেছেন। মূলত সবকিছুর সমন্বয়ই একজন মানুষকে সফলতার পথ পাড়ি দিতে সাহায্য করে। তবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, সফলতা এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়াকে ত্বরান্বিত করার অন্যতম উপাদান হচ্ছে এই 'ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স'।

যুগে যুগে ইসলামি দার্শনিক এবং বিদ্বানদের মধ্যে ইসলামের বিভিন্ন নীতি, তত্ত্ব, দর্শনকে সমসাময়িক যুগশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব ও দর্শনের সাথে একই আঙিনায় স্থাপন করার প্রবণতা ছিল। অনেকক্ষেত্রে এটা যুগের চাহিদা ছিল। কেননা ইসলাম সর্বকালের সাথে মানানসই দ্বীন হিসেবেই এসেছে। জীবন ও সমাজের এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যেখানে ইসলামি নীতির প্রয়োগ অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয় বা যেখানে ইসলাম মানবজাতির সমস্যার সমাধান দিতে পারে না।

একজন সত্যিকার চিন্তাশীল মুসলিম হলেন এমন একজন—যিনি এই বিশ্বের সমস্যাগুলির বাস্তবতা বোঝেন, নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সেগুলো ব্যবহার করেন এবং নিজেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকটবর্তী করার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় তিনি এক আল্লাহর দয়ার বরকতে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যান। মূলত একান্ত ধৈর্য এবং ন্যায়ের সাথে মহান রবের সন্তুষ্টি এবং চরিত্র গঠনের মাধ্যমে একজন মুসলিম জান্নাতের পথে এগিয়ে যায়। ইসলামে উত্তম চরিত্র বিকাশের পথ-পরিক্রমায় সে বিভিন্ন মিশ্র অনুভূতির মুখোমুখি হয়। ক্ষমা, সমবেদনা, ভালবাসা, উদারতা এবং সাহসের মতো ভালো এবং পজিটিভ অনুভূতিগুলোর সৃষ্টি ও লালন করতে থাকে। অপরদিকে হিংসা, ক্রোধের মতো নেতিবাচক অনুভূতির বিরুদ্ধে লড়াই

করে, স্বার্থপরতা এবং নৃশংসতাকে দমন করে। চরিত্র-নির্মাণে অনেক কাজ করা উচিত ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাথে অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে। নেতিবাচক মাত্রা এবং অনুভূতিগুলোকে এমনভাবে মোকাবিলা করতে হয় যেন তা শক্তিশালী ইতিবাচক অনুভূতিতে পরিণত হয়।

এই যে অনুভূতির লালন, নিয়ন্ত্রণ, চর্চা, মোকাবিলা ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের গাঁথুনি দিয়ে অনুভূতির সার্বিক কাঠামো দেওয়ার চেষ্টা করলাম—এই বিষয়টাকে আধুনিক কালের পণ্ডিতবর্গ 'ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স' বলছেন। আমরা যদি এই শব্দদ্বয়ের সংজ্ঞায়নের দিকে দৃষ্টি দিই, ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার হবে বলে আশা করছি-

"'ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স' মূলত আবেগগুলোকে উপলব্ধি করা, আবেগ-সম্পর্কিত অনুভূতিগুলিকে একীভূত করা, সেই আবেগগুলোর তথ্য বোঝা এবং সেগুলো পরিচালনা করার ক্ষমতার সাথে জড়িত।"[৪]

"ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স' হলো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে "এমন কিছু" যা কিছুটা অস্পৃশ্য। একটা পজেটিভ ফলাফলের জন্য আমরা কিভাবে আচরণ করি, সামাজিক জটিলতাগুলোকে নেভিগেট করি এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি—এই পুরো বিষয়টাকে এটি প্রভাবিত করে।"[৫]

সাইকোলজি টুডে-এর মতে, "ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স হলো আপনার নিজের আবেগ এবং অন্যদের আবেগকে চিহ্নিত করার এবং পরিচালনা করার ক্ষমতা। সাধারণত তিনটি দক্ষতা এতে অন্তর্ভুক্ত বলে বলা হয় :

১. মানসিক সচেতনতা;

২. আবেগগুলিকে কাজে লাগানোর এবং সাথে সাথে চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানের মতো কাজে প্রয়োগ করার ক্ষমতা,

৩. আবেগগুলি পরিচালনা করার ক্ষমতা, যার মধ্যে আপনার নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা এবং অন্য লোকদের উৎসাহিত করা বা শান্ত করা অন্তর্ভুক্ত।আবেগ প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অপরিহার্য। কিন্তু অন্যের আবেগ বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষমতাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এমন একটি পরিবেশের কথা কল্পনা করেন—যেখানে আপনি বুঝতে পারবেন না কখন একজন বন্ধু দুঃখ বোধ করছে বা কখন একজন সহকর্মী রাগ করছে, কখন আপনার আশেপাশের মানুষ আপনার ব্যাপারে খুশি হচ্ছে কিংবা কষ্ট

[৪] জন মায়ার, ডেভিড কারুসো, এবং পিটার সালোভে, ১৯৯৯, p. ২৬৭
[৫] Travis Bradberry & Jean Greaves, 2009, p. 17

পাচ্ছে।

অনেক বেশি তাত্ত্বিক হয়ে গেল মনে হয় ব্যাপারগুলো। আমরা একটু সামারাইজ করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে আশা করছি।

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে-

- নিজের আবেগকে (emotion) বুঝতে/চিহ্নিত করতে পারা
- অন্যের/একদল মানুষের আবেগকে বুঝতে/চিহ্নিত করতে পারা
- এই বোঝা (understanding)-কে কাজে লাগিয়ে অন্যের সাথে কাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক গড়ে তোলা অথবা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা।

গবেষণায় দেখা গেছে মানুষের জীবনে আটটি মৌলিক আবেগ আছে। এই আবেগগুলো হচ্ছে সুখ, দুঃখ, বিস্ময়, বিতৃষ্ণা, ভয়, রাগ, শঙ্কা ও বিশ্বাস। খুব সংক্ষেপে বলা যায় এই আটটি মৌলিক আবেগকে স্থান, কাল, পাত্রভেদে যথাযথভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করতে পারাই হলো 'চৌকশ বুত্তিমত্তা'।

'যথাযথভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করা' বলতে বোঝায় উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত আচরণ করার মাধ্যমে অন্যের সাথে কাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক গড়ে তোলা। ভিন্নভাবে বলা যায়, Emotional Intelligence হলো- "The ability to think before you speak and act."

মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে আপাতভাবে মনে হচ্ছে মানুষের জ্ঞান গবেষণারও যৌবনকাল পার করছি আমরা। এখনকার এ বিশ্বে ছোট-বড় প্রত্যেকটি ব্যাপারেই বিশদ গবেষণা হচ্ছে। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়েও বেশ কিছু ভালো এবং চিন্তা উদ্দীপক গবেষণা আমাদের হাতে এসেছে। ৪৫০ জন ছেলের ওপর ৪০ বছরব্যাপী একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, সাফল্যের সাথে আইকিউ খুব কমই সম্পর্কযুক্ত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে—যারা হতাশা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং অন্যান্য লোকেদের সাথে মিলিত হতে সক্ষম হয়েছিল, তারাই মূলত ভবিষ্যৎ সফলতার দিকে হেঁটেছিল। আরেকটি গবেষণাও একইভাবে চল্লিশ বছর ধরে চলেছিল, যেখানে প্রায় ৮০ জন বিজ্ঞানী কাজ করেছেন। সে গবেষণায় দেখা গেছে যে, যে-কোনো পেশার সাফল্য এবং প্রতিপত্তি নির্ধারণে সামাজিক এবং আবেগীয় দক্ষতা (EI) সব সময়কার সর্বজনস্বীকৃত গুণ। এটি IQ এর চেয়ে চারগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আরও আশ্চর্যজনক একটা সার্ভে রিপোর্ট পাওয়া যায়, যা অবসরপ্রাপ্ত ন্যাশনাল ফুটবল লিগ খেলোয়াড়দের ওপর করা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে যে, মানসিক বুদ্ধিমত্তা জীবনের সাফল্যের ৬২% পরিবর্তনের ইঙ্গিত

দিয়েছে। এবং অবশেষে ২০১১ সালের একটি জরিপে দেখা গেছে যে, ২৬০০ নিয়োগ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারদের মধ্যে ৭১% চাকরি দেওয়ার সময় IQ-এর তুলনায় EQ-কে মূল্য দেয়।[৬]

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের আবির্ভাব ও ক্রম বিবর্তন

Intelligence বা বুদ্ধিমত্তা হলো একটি গাছের মতো, যার বিভিন্ন শাখা রয়েছে, প্রতিটি শাখাই এই ইন্টেলিজেন্সের একটি নির্দিষ্ট গঠন বা রূপকে প্রতিনিধিত্ব করে। একটি গাছে যেমন অসংখ্য শাখা থাকে, ঠিক তেমনি বুদ্ধিমত্তা নামক গাছেও অসংখ্য শাখা রয়েছে। বিভিন্নজন বিভিন্নসময়ে এই শাখাগুলো নিয়ে কাজ করেছেন।

১৯০৯ সালে দার্শনিক জন ডুওয়ি[৭] সর্বপ্রথম social Intelligence বা **সামাজিক বুদ্ধিমত্তা**র ধারণার ভেতরে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স শব্দটি ব্যবহার করেন। এডোয়ার্ড থর্নডাইক[৮], ডেভিড ওয়েকস্লের[৯], মাইকেল বেলডোচ[১০]-এর মতো অনেক চিন্তাবিদ, গবেষক, সাইকোলজিস্ট এই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের ধারণাকে আস্তে আস্তে ডেভেলপ করেছেন।

এদিকে হাওয়ার্ড গার্ডনার তার বই Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences একাধিক বুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব প্রস্তাব করে যে, মানুষ তাদের সব বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জন্মায় না। এই তত্ত্বটি প্রথাগত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে একটি একক ধরনের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, যা কখনো কখনো সাধারণ বুদ্ধিমত্তার জন্য "g" নামে পরিচিত। এটা শুধুমাত্র জ্ঞানগত ক্ষমতার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বুদ্ধিমত্তার এই ধারণাকে প্রসারিত করার জন্য, গার্ডনার আটটি বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিমত্তার প্রবর্তন করেছিলেন যার মধ্যে রয়েছে : Linguistic, Logical/Mathematical, Spatial, Bodily-Kinesthetic, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, and Naturalist. গার্ডনার spiritual intelligence, existential intelligence এবং moral intelligence নামে আরও তিনটি ইন্টেলিজেন্সের কথাও উল্লেখ করেন। এখানে 'interpersonal intelligence' ও 'intrapersonal intelligence' দুটি ইন্টেলিজেন্সই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ এবং অনেক গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইন্টার-পার্সোনাল ইন্টেলিজেন্স বলতে বোঝায়, অন্য মানুষের উদ্দেশ্য, অনুপ্রেরণা ও চাহিদা বোঝার ক্ষমতা। আর ইন্ট্রা-পার্সোনাল ইন্টেলিজেন্স বলতে বোঝায়, নিজেকে

[৬] https://tinyurl.com/5a37an8b
[৭] john Dewey
[৮] Edward Thorndike
[৯] David Wechsler
[১০] Beldoch

বোঝার, নিজের আবেগ-অনুভূতি, ভয়ভীতি, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি উপলব্ধি করার ক্ষমতা।

অতঃপর ১৯৮৭ সালে কিথ বিসলে[১১] একটি আর্টিকেলে সর্বপ্রথম EQ বা 'Emotional Quotient' শব্দটি সার্বজনীনভাবে ব্যবহার করেন। এরপর এল নব্বই-এর দশক। এ দশকটি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ধারণাটির জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এসময় জন মেয়ার এবং পিটার সেলোভে *"Imagination, Cognition, and Personality"* জার্নালে *Emotional Intelligence* নামে একটি আর্টিকেল ছাপান। বলা হয় এটাই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের ওপর প্রথম চিন্তাশীল কোনো একাডেমিক লেখা। এ দুজন লেখকের কাছ থেকে "ইমোশনাল ইন্টলিজেন্স' শব্দটি ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে বিখ্যাত সাইকোলজিস্ট এবং লেখক ডেনিয়েল গোলম্যান একটি বই লেখেন। বইটির নাম দেন *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ* যা ১৯৯৫ সালে ছাপানো হয়। মূলত এই বইটির মধ্য দিয়েই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের আইডিয়াটি গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা পায়। তিনিই মূলত এর মূল গঠনতন্ত্র ঠিক করে দেন। অতঃপর সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্সের ওপর আরেকটি বই রচনা করে বিষয়টাকে আরও বেশি পাকাপোক্ত করেন।[১২]

এ তো গেল ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের পুঁথিগত ইতিহাস। সত্যিকার অর্থে এর ইতিহাস লক্ষ কোটি বছরের পুরনো। যেদিন প্রথম মানুষটি দুনিয়ায় আসেন, সেদিনই এর সূত্রপাত। মানুষ-মাত্রই আবেগীয় প্রাণী। কোনো মানুষই আবেগ থেকে মুক্ত নন এবং প্রতিটি মানুষের মাঝেই কিছু না কিছু পরিমাণ আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা বিরাজমান। তাই বলা যেতে পারে, *Emotional Intelligence* এর ইতিহাস ও মানবজাতির ইতিহাস সমসাময়িক। মানব ইতিহাসের প্রথম মানব আদম ﷺ-এর দুই সন্তান হাবিল এবং কাবিলের মধ্যে বিবাদ হয়। তখন কাবিল হাবিলকে মারতে উদ্যত হয়। হাবিল আল্লাহকে ভয় করে কাবিলকে মারা থেকে বিরত হয়।

> "আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি আমার প্রতি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার প্রতি হাত তুলব না। আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি।"[১৩]

পরস্পর মারামারি করার মাধ্যমে দুনিয়াতে আরও ফাসাদের উদাহরণ না রেখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই শ্রেয় ভেবেছেন হাবিল। এই যে আল্লাহর ভয় থেকে উৎসারিত আত্মনিয়ন্ত্রণ, এটাও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সেরই অংশ।

---

[১১] Keith Beasley
[১২] https://tinyurl.com/mabjxp67
[১৩] সূরা মায়িদা, ৫:২৮

"নিজেকে জানো"- নিজের সম্পর্কে আত্মসচেতনতার এই শিক্ষা যুগযুগ ধরে সক্রেটিসের মতো দার্শনিকরা দিয়ে এসেছেন। যারা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের বিভিন্ন দিকগুলি বুঝতেন এবং সে সম্পর্কে কথা বলতেন তাদের মধ্যে এরিস্টটল ছিলেন প্রথম সারিতে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জীবনের অনেক দিক যেমন শেখা, নিজেকে প্রকাশ করা এবং নেতিবাচক আবেগগুলি পরিচালনা করার জন্য এর গভীর গুরুত্ব রয়েছে। তিনি জানতেন হৃদয়কে শিক্ষিত না করে মনকে শিক্ষিত করার নাম শিক্ষা নয়। মানুষের ইমোশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা। এরিস্টটল রাগ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, "যে-কেউ রাগান্বিত হতে পারে, এটি সহজ। তবে সঠিক ব্যক্তির ওপর, সঠিক মাত্রায়, সঠিক সময়ে, সঠিক উদ্দেশ্যে এবং সঠিক উপায়ে রাগ করা—এটি সহজ নয়।"

এরিস্টটল জানতেন, মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। প্রত্যেক মানুষ তাদের নিজস্ব অভ্যাস, আবেগ এবং ইচ্ছা দ্বারা চালিত। এরিস্টটল আবেগ দমনে বিশ্বাসী ছিলেন না। কারণ, তিনি কষ্ট এবং ক্রোধের মতো নেতিবাচক অনুভূতিগুলোকে মানুষের জন্য অনিবার্য হিসাবে দেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এই চ্যালেঞ্জগুলোকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করা একজন ব্যক্তির আত্মার সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করে।

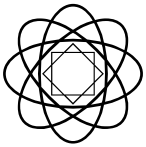

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের উপাদানসমূহ

গোলম্যান (১৯৯৫) ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের পাঁচটি উপাদান প্রস্তাব করেন। যদি কারো মাঝে এই ৫টি গুণ থাকে, তবে বলা যেতে পারে তিনি একজন Emotionally Intelligent মানুষ। অর্থাৎ, অনুভূতির দিক থেকে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ। উপাদানগুলো হলো-

- আত্মসচেতনতা (Self-awareness)
- আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-regulation)/আত্মব্যবস্থাপনা (Self-management)
- আত্ম-অনুপ্রেরণা (Self-motivation)
- সহমর্মিতা (Empathy)
- সামাজিক যোগাযোগের দক্ষতা (Social skill)

সাম্প্রতিক গবেষণায়, মেয়ার এবং স্যালোভারি (১৯৯৭) নিজেদের মতো করে EI-এর পাঁচটি উপাদান প্রস্তাব করেন। যার মধ্যে Goleman এর প্রস্তাবিত উপাদান গুলোর তিনটি রয়েছে, সাথে সাথে তারা দুটি উপাদান নতুন করে সংযুক্ত করেছেন। Mayer and Salovey এর উপাদান গুলো হলো-

- আত্মসচেতনতা (Self-awareness)
- আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-regulation)/ আত্মব্যবস্থাপনা (Self-management)
- আত্ম-অনুপ্রেরণা বা স্ব-প্রণোদনা (Self-motivation)
- অন্যের ইমোশানগুলো বোঝা (recognizing emotions in others)

- সম্পর্কগুলোকে সতেজ রাখা (handling relationships)

আমরা এগুলো সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এসকল উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত জানব। এখন শুধুমাত্র এই উপাদানগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে রাখাই যথেষ্ট হবে।

আত্মসচেতনতা হলো নিজের আবেগকে বুঝতে পারা, নিজের সক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের ধরণ সম্পর্কে জানা। এই উপাদানটির সাথে আত্ম-মূল্যায়ন এবং আত্মবিশ্বাসের বিষয়াদিও জড়িত।

» **আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মব্যবস্থাপনা :** নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা।

» **আত্ম-অনুপ্রেরণা :** কাজের জন্য নিজের ভেতর থেকে একটা তীব্র তাড়না বোধ করা এবং প্রতিটি কাজ করার সময় 'কার্যকারণ' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা।

» **সহমর্মিতা :** অন্যের প্রতি সমব্যথী হওয়া। অন্যের স্থানে নিজেকে বসিয়ে তার অবস্থা অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া।

» **সামাজিক যোগাযোগের দক্ষতা :** মানুষ একটা দলের মধ্যে কিভাবে চিন্তা করে বা কাজ করে, তা বুঝতে পারা। আর এই বুঝকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক যোগাযোগ ও সামাজিক সম্পর্কগুলিকে ফলপ্রসূ করে তোলা।

» **অন্যের আবেগগুলো বোঝা :** অন্যদের কী প্রয়োজন কিংবা তারা কী চায় এই ব্যাপারটির পূর্বাভাস বুঝে কাজ করার দক্ষতা। গোলম্যানের সামাজিক দক্ষতা অবশ্য এই উপাদানটির অনেকগুলো ধারণাকেই অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে।

» **সম্পর্কগুলোকে সতেজ রাখা :** কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা। সম্পর্ক তৈরি এবং টিকিয়ে রাখতে একজন ব্যক্তিকে দক্ষ হতে হবে। এই উপাদানটিও মূলত গোলম্যানের সহমর্মিতা এবং সামাজিক যোগাযোগ ক্ষমতার সাথে মিলে যায়। তাই আমরা মূলত গোলম্যানের পাঁচটি উপাদানকে সামনে রেখেই এগোব এবং সেটারই বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব।

রাসূল ﷺ-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা দিয়ে গোলম্যানের দেওয়া পাঁচটি উপাদান বোঝা যায়। এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব, রাসূল ﷺ কিভাবে বিচক্ষণ অনুভূতির উপাদানগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে কিভাবে তা ফুটিয়ে তুলেছেন।

মক্কী জীবনেই শিশু অবস্থায় রাসূল তাঁর তিন পুত্র সন্তানকে হারান। মদীনার জীবনে

এসে তাঁর পুত্র ইবরাহীম হিজরতের দশম বছরে মারা যান। তার বয়স ছিল ষোলো মাস (কোথাও এসেছে আঠারো মাস) এবং তিনি মারা যাওয়ার সময় একজন সেবিকার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তার ছেলের কী ঘটেছে তা শুনে, নবি মুহাম্মাদ ﷺ অবিলম্বে সেবিকার বাড়িতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি ইবরাহীমকে তাঁর হাতে তুলে ধরেছিলেন এবং তাঁর চোখ থেকে অনবরত অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল। তখন আব্দুর রহমান ইবনু আওফ ﷺ (ভিন্ন বর্ণনায়- অন্য এক সাহাবি) অবাক হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনিও কাঁদেন?" তখন রাসূল ﷺ বললেন, "এটা হলো রহমত। চোখ অশ্রু সজল হবে এবং হৃদয় বিষণ্ণ হবে। কিন্তু মুখ দিয়ে শুধু তাই বের হবে যা আল্লাহ পছন্দ করেন—হে ইবরাহীম, তোমার বিদায়ে আমরা শোকাহত।" অতঃপর তিনি তাঁর সামনের পাহাড়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,

"হে পাহাড়! তুমি যদি আমার মতো দুঃখী হতে, তুমি অবশ্যই টুকরো টুকরো হয়ে যেতে! কিন্তু আমরা তা বলি যা আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন : (আমরা আল্লাহর বান্দা এবং আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব; আমরা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি)

কোনো কোনো সীরাতের বর্ণনায় রয়েছে, নবি ﷺ-এর কান্না দেখে উসামা বিন যায়িদ ﷺ-সহ অন্যান্য সাহাবিরাও কেঁদেছিলেন। যেদিন নবি ﷺ পুত্র ইবরাহীম ইন্তেকাল করেন সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। কিছু লোক, যারা প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, তারা মনে করেছিল যে ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। যদিও এই চিন্তা একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল, তবুও এটা আপাতদৃষ্টিতে নবির জন্য উপকারী হতে পারে। সেক্ষেত্রে, যদি তিনি একজন সাধারণ এবং একজন জাগতিক নেতা হতেন, তবে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গিটি খুব ভালোভাবে নিতে পারতেন এবং এইভাবে নিজের মহিমা ও মহত্ত্ব সকলের কাছে প্রমাণ করতে পারতেন।

কিন্তু তিনি সেটা করলেন না। মানুষকে ভুলের মধ্যে রেখে নিজের ফায়দা নেওয়ার মতো নেতা তিনি ছিলেন না। তিনি যদি এই ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে সেদিন সমর্থন করতেন তাহলে বর্তমান যুগে যখন জ্যোতির্বিজ্ঞান যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে তখন তিনি নিজেকে মানবজাতির শাশ্বত নেতা, প্রতিনিধি এবং আল্লাহর মনোনীত একজন রাসূল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হতেন না। কারণ সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ মানবজাতির কাছে স্পষ্টভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। তিনি সোজা মাসজিদে গেলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করার পর সাহাবিদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কথাগুলো বললেন :

"হে লোকসকল! তোমরা জেনে রাখো যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন।

তারা একটি নির্দিষ্ট গতিপথে চলাফেরা করে, যা আল্লাহ তাদের জন্য প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারণ করেছেন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে তাদের গ্রহণ লাগে না। সূর্যগ্রহণের সময় নামাজ পড়া তোমাদের কর্তব্য।"[১৪]

রাসূল ﷺ-এর জীবনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা থেকে আমরা কিভাবে তার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের ধারণা পাই, সেটা নিয়ে আলোচনা করব।

আত্মসচেতনতা : রাসূল ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সন্তানের মৃত্যুতে কান্না আসাটাই স্বাভাবিক এবং একজন পিতার পক্ষে তা রোধ করা অসম্ভব ব্যাপার। যে ব্যক্তি তার কাছের মানুষের মৃত্যুতে বিচলিত হয় না, যার হৃদয় নড়ে না, যার চোখ অশ্রু ঝরে না, সে তো পাথর ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ মানবজাতিরই একজন ছিলেন। কুরআনেও স্পষ্টভাবে দুইবার তাঁকে মানুষ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সীরাত এবং বিভিন্ন হাদীস থেকে বোঝা যায়, তিনি তার মানবসত্তা সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। একদিন নামাজে ভুল করার পর সাহাবিরা তাঁকে অবগত করলে তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের মতোই মানুষ। আমি স্মরণ রাখি, যেমন তোমরা স্মরণ রাখো। আবার আমি ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও।'

আত্মনিয়ন্ত্রণ : "চোখ অশ্রুসজল হবে এবং হৃদয় বিষণ্ন হবে, কিন্তু মুখ দিয়ে শুধু তাই বের হবে যা আল্লাহ পছন্দ করেন।" রাসূল ﷺ হাদীসের মধ্যেও কারও মৃত্যুতে বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন। এভাবে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা তিনি দিয়েছেন।

আত্ম-অনুপ্রেরণা : "মুখ দিয়ে শুধু তাই বের হবে যা আল্লাহ পছন্দ করেন"- এই কথা থেকে বোঝা যায়, রাসূল ﷺ জানতেন তিনি কেন নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। স্পষ্টভাবে তিনি সেটা বলেও গেছেন। এর কারণ হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি।

সহমর্মিতা : রাসূল ﷺ-এর এই অবস্থা দেখে উসামা বিন যায়িদ-সহ অন্যান্য সাহাবিরা কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর আশেপাশের মানুষজন তার বেদনায় ব্যথিত হয়েছেন। এতে সাহাবিদের সহমর্মী হওয়ার বিষয় চোখে পড়ে। অনেক সীরাতে ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, কোনো কোনো সাহাবির মৃত্যুতে রাসূল ﷺ নিজেও অঝোরে কেঁদেছেন। সাহাবির লাশ নিজ হাতে কবরস্থ করেছেন। সাহাবিদের পরিবার-পরিজনকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। মুতার যুদ্ধের পর জাফর বিন আবি তালিব ﷺ-এর পরিবারের প্রতি নবি ﷺ-এর সান্ত্বনা দেওয়ার ঘটনাটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সীরাতের এরকম অসংখ্য ঘটনায় রাসূল

[১৪] Ibn Sa'd, ibid, Vol. 1, p. 142; Muslim, ibid, Vol. 2, p. 630.

ﷺ-এর সহমর্মিতার গুণটি ধরা পড়ে।

সামাজিক দক্ষতা : একজন ব্যক্তির দুঃখে আরেকজন মানুষ কতটা সমব্যথী হচ্ছে, তা ওই ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্কগুলোর ওপর নির্ভর করে। রাসূল ﷺ-এর পূত্রের মৃত্যুতে সাহাবিরা সমান দুঃখে দুঃখিত হয়ে কান্না করলেন। আবার এই দুঃখ এবং রাসূল ﷺ-এর প্রতি সম্মান তাঁদেরকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখেনি। তারা জানতেন কারো মৃত্যুতে রাসূল কান্না করতে নিষেধ করেছেন, আবার এখন তিনি নিজেই কাঁদছেন! কেন এই বৈপরীত্য?

অসময়ে এমন প্রশ্ন রাসূল ﷺ-কে বিচলিত করেনি। বরং তিনি ঠান্ডা মেজাজে জবাব দিলেন, "এটা হলো রহমত। চোখ অশ্রুসজল হবে ..."

রাসূল ﷺ তাঁদের সামনে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করলেন। প্রাকৃতিকভাবে চোখে পানি আসবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিলাপ করা যাবে না। এমন কিছু বলা যাবে না, যা আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ হিসেবে শোনায়। বরং ধৈর্যের সাথে পুরো পরিস্থিতি শামাল দিতে হবে।

আমরা সীরাত থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম—রাসূল ﷺ কিভাবে অনুভূতির ক্ষেত্রে ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

পেশাগত এবং পারিবারিক জীবনে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স

১. কর্ম ও পেশাগত জীবনে

যেকোনো পেশা কিংবা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সফলভাবে চালাতে হলে দরকার বিচক্ষণ অনুভূতিসম্পন্ন পরিচালক। একজন নেতা যদি চৌকশ না হন, তবে সহকর্মী ও অধীনস্থদের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে না। ফলে কর্মীদের কর্মদক্ষতা এবং উৎপাদন শক্তি কমে যাবে। আর এগুলোর শেষ ফলাফল হলো ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

যেকোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মী ও অধীনস্থদের মনোবল চাঙা রাখতে হলে তাদের আবেগ-অনুভূতির মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি। অনেক সময় কর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে যে ফলাফল পাওয়া যায়, তাদের বেতন বৃদ্ধি করেও সেটা হয় না। পেশাগত জীবনে বিচক্ষণ অনুভূতির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব ইন শা আল্লাহ।

২. পারিবারিক জীবনে

পারিবারিক জীবনেও বিচক্ষণ অনুভূতি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটি পরিবারে যারা নিজেদের ও অন্যান্য সদস্যদের আবেগ সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং এই সচেতনতাকে পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নে কাজে লাগায়, তাদের সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সুসম্পর্ক বজায় থাকে। আবার যারা আবেগের বিষয়টিকে উপেক্ষা করে নিজের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সর্বদা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাদের সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রায়ই ঝামেলা বাধে। কারণ, মানুষ একইসাথে বুদ্ধিমান ও আবেগী প্রাণী। তাই একজন মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বিনির্মাণের ক্ষেত্রে আবেগকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করা যথেষ্ট নয়।

স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের উচিত অন্যের আবেগকে বোঝার চেষ্টা করা। এই ব্যাপারে রাসূল ﷺ আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ ও শিক্ষা রেখে গেছেন।

একদা রাসূল ﷺ আয়িশা ﵂-কে বললেন, "আমি বুঝতে পারি যে কখন তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট আর কখন অসন্তুষ্ট থাকো। যখন তুমি বলো 'মুহাম্মাদের রবের কসম' তখন বুঝি—তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট। আর যখন বলো 'ইবরাহীমের রবের কসম' তখন বুঝি—তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট।"[১৫]

স্ত্রীর আবেগকে এত নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করার শিক্ষা রাসূল ﷺ ছাড়া আর কার কাছে পাব?

আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার এই প্রয়োগ বাবা-মা'র সাথে সন্তানের বন্ধনও মজবুত করতে কাজে লাগে। বাবা-মা যদি সন্তানের আবেগ বুঝতে পারে এবং বুঝতে পারে যে, কোন সময়ে ও কোন পরিস্থিতিতে সে আদেশ মেনে চলতে প্রস্তুত, তবে ওই পরিস্থিতি বুঝে তাকে শিক্ষা দেওয়া সহজ হবে। এবং এই শিক্ষা সন্তানের জন্য উপকারী হবে। সন্তানের মানসিক অবস্থা যাচাই না করে যখন-তখন উপদেশ দিতে থাকলে তা কেবল অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করবে।

রাসূল ﷺ একেবারে ছোট বাচ্চাদের আবেগকেও মূল্যায়ন করেছেন। তিনি যখন মদীনার রাস্তায় হেঁটে বেড়াতেন, তখন মাঝে মাঝে বাচ্চারা তাঁর হাত ধরে ফেলত। তাঁকে নিয়ে অনেক দূর চলে যেত। বাচ্চা হাত ছাড়া না পর্যন্ত রাসূল ﷺ ওর হাত ছেড়ে দিতেন না। অর্থাৎ যে আবেগ থেকে বাচ্চারা রাসূল ﷺ-এর হাত ধরত, তিনি সেই আবেগটিকে নষ্ট হতে দিতেন না। একইভাবে যখন তিনি নামাজে সিজদায় যেতেন, তখন হাসান-হুসাইন তাঁর পিঠে উঠে যেত ঘোড়া ঘোড়া খেলার জন্য। যতক্ষণ না তারা পিঠ থেকে নামত, ততক্ষণ রাসূল ﷺ সিজদা থেকে মাথা ওঠাতেন না। এগুলো সবই সামাজিক দক্ষতার জীবন্ত উদাহরণ।

মোট কথা, একজন বিচক্ষণ অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ-

- কঠিন পরিস্থিতি যথাযথভাবে সামাল দিতে পারে।
- নিজের কথাগুলো যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে।
- অন্যদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে নের্তৃত্ব দিতে পারে।
- দরকষাকষির সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- অন্যদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে।

---

[১৫] সহীহুল বুখারি : ৬০৭৮

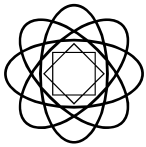

আবেগ ও বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা

ইসলাম আবেগ এবং বুদ্ধিমত্তা উভয়কেই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে এবং মানুষকে তার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের সর্বোচ্চ প্রয়োগে উৎসাহিত করেছে। এই বিচক্ষণতার যে ৫টি প্রধান উপাদান রয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটির ব্যাপারে রয়েছে ইসলামের পৃথক নির্দেশনা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে রয়েছে বাস্তব প্রয়োগ। তবে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের সমকালীন থিওরিগুলির সাথে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা মানুষের মাঝে আবেগ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আবেগের যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই সম্ভব আধ্যাত্মিকতার উন্নত স্তরে উপনীত হওয়া।

সমকালীন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের কাছে Intelligence বা বুদ্ধিমত্তা নিছক উপস্থিত বুদ্ধি, আবেগ ও অন্যান্য দক্ষতার একটি মাপকাঠি এবং পরিচায়ক। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এর সংজ্ঞা আরও ব্যাপক। এর ব্যাপারে ইসলামের রয়েছে নিজস্ব মতামত। এই মতামত উপলব্ধি করতে হলে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে কুরআনের একটি আয়াত,

> *"আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্টদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের ওপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। আবার না কেয়ামতের দিন বলতে শুরু করো যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।"* [১৬]

---

[১৬] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৭২

আদম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ায় আসবে তাদের প্রত্যেককে রুহের জগতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রব সম্পর্কে। প্রতিটি মানুষ এই তখন এই সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আমাদের রব আল্লাহ। আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের বিষয়টি আমাদের রুহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মানুষ হিসেবে আমাদের যে 'বিশুদ্ধ বুদ্ধিমত্তা' বা 'ফিতরাত' রয়েছে, তা অবশ্যই আল্লাহর বিধি-নিষেধের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলবে। বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে এভাবে বলা যায়, কোনো কোম্পানি যে ডিভাইস তৈরি করবে তারা তাদের নিজেদের পছন্দমতো ফিচারই ওই ডিভাইসে রাখবে এবং ডিভাইসটি সেই মোতাবেক চলবে। একইভাবে, আল্লাহ যেহেতু মানুষ এবং মানুষের বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টি করেছেন, তাই মানুষজন কেবল আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ীই স্বাভাবিক নিয়মে চলতে পারবে। ইসলামের বিধিবিধানের সাথে বিশুদ্ধ বুদ্ধিমত্তা বা ফিতরাতের কোনোরূপ সংঘর্ষ সে খুঁজে পাবে না।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, বর্তমানে অনেকেই ইসলামের কিছু বিধিবিধানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। এদের মধ্যে অমুসলিম যেমন আছে, মুসলিমও আছে। এর কারণ হলো 'ফিতরাত' বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। পারিপার্শ্বিক বহুবিধ নিয়ামকের কারণে ফিতরাত বিগড়ে গেছে। তাই আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আমরা এখন আল্লাহর সাথেই বিরোধে জড়িয়ে পড়ছি।

এজন্য মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, বুদ্ধিমত্তা বা আকলের স্বার্থক প্রয়োগ তখনই বলা যাবে, যখন তা আল্লাহর আনুগত্যের পথে ব্যয়িত হবে। আল্লাহর দেওয়া যাবতীয় বিধান মাথা পেতে নিয়ে, নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলেই আকলের সফল বাস্তবায়ন ঘটবে।

যাই হোক, সাধারণ অর্থে ইন্টেলিজেন্স শব্দটি সামনে আসলে যদিও আমাদের মস্তিষ্কে আইনস্টাইনের ছবি ভেসে ওঠে, তবে আধুনিক ধারণায় IQ এর সাথে EQ অনেকটা জড়িয়ে গেছে সেটা আমরা আগেই বলেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য নবিগণ যে বার্তা নিয়ে মর্ত্যের বুকে বিচরণ করেছেন এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকেছেন তার সাফল্য অনেকখানি এই EQ দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল ছিল।

আসমানি বার্তাগুলো কিভাবে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে, কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে, কিভাবে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে, কিভাবে প্রতিক্রিয়াকে যথাযথ খাতে প্রবাহিত করতে হবে, এগুলো নবিদের জানা ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। 'রাসূল ﷺ-এর চরিত্র ছিল কুরআন'। আম্মাজান আয়িশা ﵂-এর এই বর্ণনার মতোই ছিল নবি ﷺ-এর জীবন। কুরআনের ছাঁচে গড়া ছিল তাঁর চরিত্রের প্রত্যেকটি দিক। সাহাবিদের সাথে রাসূল ﷺ-এর কেমন ছিলেন

তাঁর একটা চিত্র কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে :

> "সুতরাং আল্লাহর পরম অনুগ্রহ যে তুমি তাদের ওপর দয়ার্দ্র রয়েছ, এবং যদি তুমি রূঢ় মেজাজ ও কঠিন হৃদয় হতে তবে অবশ্যই তারা তোমার নিকট হতে সরে যেত।"[১৭]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূল ﷺ-এর সাথে সাহাবিদের পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। এ বইয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে সেসবের অসংখ্য উদাহরণ আসবে। তবে এখানে কথাপ্রসঙ্গে দু-একটা হাদীস তুলে ধরা যেতে পারে। যার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়।

আবু উমামা আল বাহিলি ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন—"হে আবু উমামা! মুমিনদের মাঝে কারো কারো জন্য আমার অন্তর নরম হয়ে যায়।"[১৮]

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন, "দুই ব্যক্তি পরস্পরকে মহব্বত করলে, তাদের মধ্যে যে অপরজনকে বেশি মহব্বত করে সে-ই উত্তম।"[১৯]

অন্যত্র তিনি বলেন, "তোমাদের কেউ তার অপর (মুসলমান) ভাইকে মহব্বত করলে সে যেন তাকে (মহব্বতের ব্যাপারটি) জানিয়ে দেয়।"[২০]

দাওয়াহ মূলত অন্তর থেকে অন্তরে হয়। রাসূল ﷺ সাহাবিদের সাথে অন্তরের যোগাযোগকে আগে প্রাধান্য দিয়েছেন। তারপর তিনি তাদেরকে বাহ্যিক দিকে আহ্বান করেন। এই অন্তরে অন্তরে বাঁধার প্রক্রিয়া যে দক্ষতার ওপর নির্ভর করে, সেটাই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। নিজেদের মধ্যকার যে দেয়াল সেটাকে ভেঙেই অন্তরের বন্ধন করতে হয়। সে দেয়াল হতে পারে সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক। যাদের সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে তাদেরকে বার্তা পৌঁছানোর জন্য কোনো অযাচিত দেয়ালই তাদের মধ্যে রাখা যাবে না। রাসূল ﷺ প্রথম যখন ওহীর দাওয়াত দেন, তখন তাঁর এবং কুরাইশদের মধ্যে কোনো অবিশ্বাসের দেয়াল আছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, 'আমি যদি তোমাদের বলি এই পাহাড়ের অপর পাশে শত্রুরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তোমরা বিশ্বাস করবে?' সবাই সমস্বরে জবাব দিল, 'হ্যাঁ আমরা বিশ্বাস করি। কারণ আপনি আস-সাদিক।' তারপর তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন।

মূসা ﷺ দাওয়াত দেওয়ার প্রাক্কালে জানতেন যে, তাঁর ভাষার জড়তা আছে। এটা

---

[১৭] সূরা আলে ইমরান-১৫৯
[১৮] মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২১৭
[১৯] হাকিম, ইবনে হিব্বান
[২০] আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, হাকিম, ইবনে হিব্বান

হয়তো দাওয়াতের পথে অন্তরায় হতে পারে। তাই তিনি ভাষার জড়তা দূরীকরণ চেয়েছিলেন রাব্বুল আলামীনের কাছে। তিনি তাঁর ভাইকে সাহায্যকারী হিসেবে চেয়েছিলেন। যেন সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে তিনি শক্তিশালী হতে পারেন। আল্লাহর নবিরা জানতেন, দাওয়াতি কার্যক্রম অনেকগুলো বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। তাই তাঁরা দাওয়াতের ময়দানে যাওয়ার আগে সকল অন্তরায়গুলো দূর করার চেষ্টা করতেন।

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং উপাদানের গভীরে যাওয়ার আগে উপরিউক্ত ঘটনার সূত্র ধরে আরেকটি নতুন আইডিয়ার আলোচনা রাখতে চাই—spiritul Intelligence বা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তা। বর্তমান দুনিয়ায় কর্পোরেট সেক্টরে যারা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কথা বলেন, ট্রেনিং দিয়ে থাকেন ও এই বিষয়ে কনসালটেন্সি করেন তারা হয় এই ব্যাপারটি বুঝেন না কিংবা বুঝলেও এড়িয়ে যান। এতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ইন্টেলিজেন্সের (IQ) সাথে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের (EQ) ব্লেন্ড হলেও এই আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তার (SQ) কন্সেপটটি আলোচনা না হওয়ায় পুরো বিষয়টাতেই কিছু শূন্যতা থেকে যায়। তাই বইয়ের এই পর্যায়ে "Spiritual Intelligence" নামের নতুন আরেকটি তত্ত্ব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

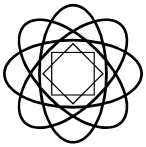

স্পিরিচুয়াল ইন্টেলিজেন্স বা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তা

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে অনেক গবেষণা-আলোচনা হলেও এই স্পিরিচুয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আলোচনা একদমই অপ্রতুল। গার্ডনার (১৯৮৩) তার বইয়ে প্রথম 'existential intelligence' নামে একটা টার্ম নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে অনেকে সেটিকে Spiritual intelligence নাম দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই

শব্দটি "spirituality" এবং "intelligence" শব্দ থেকে এসেছে। "spirituality" শব্দটি মূলত "spirit," শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ "রুহ" বা আত্মা। ইসলামে আধ্যাত্মিকতা 'রুহানিয়াত' এর প্রতিনিধিত্ব করে, যার অর্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে আধ্যাত্মিক বা রুহানি বুদ্ধিমত্তার মানে হচ্ছে, বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ককে উপলব্ধি করা। এই ইন্টেলিজেন্স মানে এক অতিন্দ্রীয় সত্তাকে ভয় করে চলা। যাকে ইসলামিক পরিভাষায় আমরা 'তাকওয়া' বলে থাকি ।

মানুষের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সকে প্রভাবিত করার জন্য, স্পিরিচুয়াল ইন্টেলিজেন্সের উন্নতি দরকার। একটা সংগঠন কিংবা প্রতিষ্ঠান যদি তার সদস্য কিংবা কর্মীদের জীবনের অর্থ খোঁজা এবং বুঝতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে এটি প্রত্যেক সদস্যদের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

মুসলিম জনগণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপদেশের অনুসারী। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত সকল কাজের জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীস হলো মুসলমানদের গাইডলাইন। ইসলামি ধারণা এবং আদর্শ উভয়ই সমস্ত মুসলিম উম্মাহর ওপর বড় প্রভাব ফেলে। ইসলামের বিভিন্ন নীতি-আদর্শ, আচার-আচরণ এবং আল্লাহভীতি—

তাদের মাঝে একটি দৃঢ় চেতনা সৃষ্টি করে এবং আরও ভালো কাজের জন্য উৎসাহ যোগায়। ইসলামি মূল্যবোধ এবং অনুভূতি কিভাবে তাদের জীবনকে আধ্যাত্মিক এবং মানসিকভাবে চালিত করে, সে বিষয়টি সাইকোলজিক্যাল এবং সাংগঠনিক আচরণ অধ্যয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা অত্যাবশ্যক। তাই মুসলিম পরিচালকদের আধ্যাত্মিকভাবে উদ্‌বুদ্ধ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনোবিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের গবেষণায়, কর্মক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তা এবং EI এর গুরুত্ব নিশ্চিত হয়েছে।

ইসলামি স্পিরিচুয়ালিটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপস্থিতি উপলব্ধি করতে সহায়তা করে যাকে আমরা 'তাকওয়া' বলে থাকি। তাকওয়া ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ আত্ম-সচেতনতা, চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়াকে উন্নত করতে সহায়তা করে। 'তাকওয়া' মানে আল্লাহর প্রতি অনুগত ও নিষ্ঠাবান হওয়া। আল্লাহর ভয়ে হারাম জিনিস থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

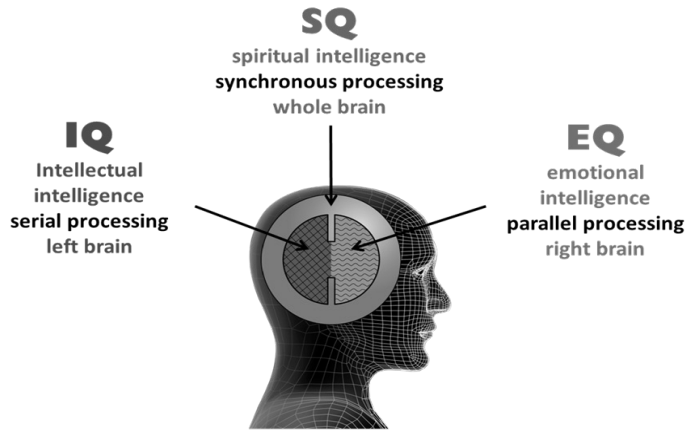

picture [২১]

আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তা EQ এবং IQ উভয়ের সাথেই কাজ করে। আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তা মস্তিষ্কের একটি শারীরিক প্রক্রিয়া, যার সাথে দুটি ভিন্ন দিক সংযুক্ত—বুদ্ধি এবং আবেগ। আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তা মূলত মন এবং শরীর, যুক্তি এবং আবেগের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ। রাসূল ﷺ-এর জীবনে এ তিন বুদ্ধিমত্তার অসংখ্য উদাহরণ আমরা পাই। যেমন, হিজরি অষ্টম সনের একটি ঘটনাই ধরুন।

[২১] https://sqi.co/definition-of-spiritual-intelligence/

সে সময় মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়। বিষয়টি যাতে প্রতিপক্ষ কুরাইশরা জানতে না পারে সেজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে সতর্ক করে দেন। হযরত হাতিব মক্কায় বসবাস না করলেও কুরাইশদের সাথে পুরাতন বন্ধুত্ব ছিল। তিনি মদীনাবাসীদের এই গোপন প্রস্তুতির খবরসম্বলিত একটি পত্রসহ এক মহিলাকে মক্কার দিকে পাঠান। এর বিনিময়ে মহিলাটিকে তিনি নির্ধারিত মজুরী দেবেন বলে চুক্তি হয়। পত্রখানি মাথার চুলের বেণীর মধ্যে লুকিয়ে মহিলাটি মক্কার দিকে যাত্রা করে। এদিকে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ সব খবর অবগত হলেন। সাথে সাথে তিনি মহিলাটির পিছু ধাওয়া করে পত্রটি উদ্ধারের জন্য আলী, যুবাইর ও মিকদাদকে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা তিনজন খুব দ্রুত সাওয়ারী দাবড়িয়ে "খালীকা" মতান্তরে "রাওদাতু খাক" নামক স্থানে মহিলাকে ধরে ফেলেন।

প্রথমে তাঁরা তার বাহনে সন্ধান করে কিছুই পেলেন না। তারপর হযরত আলী রা: মহিলাকে বললেন, "আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺকে মিথ্যা খবর দেওয়া হয়নি এবং আমাদেরকেও মিথ্যা বলা হয়নি। হয় তুমি নিজেই পত্রটি বের করে দাও, নয়তো আমরা তোমাকে উলংগ করে তালাশ করব।" তাঁদের এ কঠোরতা দেখে মহিলা বললো, তোমরা একটু সরে যাও। তারা সরে দাঁড়ালেন। সে তার মাথার বেণী খুলে তার মধ্য থেকে পত্রটি বের করে দিল। তারা তিনজন পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে হাজির হলেন।

পত্রটি পড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেন, ওহে হাতিব তুমি এমন কাজ কেন করলে? হাতিব বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবেন না। যদিও আমি কুরাইশ বংশের কেউ নই, তবুও জাহিলী যুগে তাদের সাথে আমার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যেহেতু মুহাজিরদের সকলে তাদের মক্কাস্থ আত্মীয় বন্ধুদের সাহায্য সহায়তা করে থাকেন, এজন্য আমার ইচ্ছে হলো, আমার আত্মীয় স্বজনদের সাথে কুরাইশরা যে সদ্ব্যবহার করে থাকে তার কিছু প্রতিদান কমপক্ষে আমি তাদের দান করি। এ কাজ আমি মুরতাদ হয়ে বা ইসলাম ত্যাগ করে অথবা কুফরকে ইসলামের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণে করিনি।[২২]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হাতিব বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পরিবার পরিজন তাদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য ক্ষতিকর হবে না-এমনটি মনে করেই আমি চিঠিটি লিখেছি। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আল্লাহ সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ দেখা দেয়নি। কিন্তু মক্কায় আমি ছিলাম একজন বহিরাগত এবং সেখানে আমার মা, ভাই ও ছেলেরা রয়েছে।[২৩]

---

[২২] সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী : ৪২৭৪।
[২৩] আল ইসাবা-১/৩০০ হায়াতুস সাহাবা-২/৪২৫

হাতিবের বক্তব্য শুনার পর রাসূলে কারীম ﷺ উপস্থিত সাহাবিদের লক্ষ্য করে বললেন, সে সত্য কথাটি প্রকাশ করে দিয়েছে। এ কারণে কেউ যেন তাকে গালমন্দ না করে।

উমার রা: আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে আল্লাহ, রাসূল ও মুসলমানদের প্রতি আস্থাহীনতার কাজ করেছে। অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে কি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি? আল্লাহ বদরের যোদ্ধাদের অনুমতি দিয়েছেন, তোমরা যা খুশি কর জান্নাত তোমাদের জন্য অবধারিত। রহমাতুল লিল আলামীন দয়ার নবির এ অপূর্ব উদারতায় উমারের দু চোখ সজল হয়ে ওঠে।[২৪]

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়,

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের আচরণ কর, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে।"[২৫]

এ ঘটনা থেকে হাতিব ﷺ এর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখব তাঁর পরিবারের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ইমোশন। সাথে সাথে বুদ্ধি খাটিয়ে মহিলার চুলের বেনীর ভেতরে চিঠি পাঠানো। কিন্তু ইন্টেলিজেন্সের অনুপস্থিতির কারণে তিনি বুঝতেও পারেননি কত বড় ভুল তিনি মুসলিম কমিউনিটির সাথে করছিলেন।

অপরদিকে রাসূল ﷺ-এর ইন্টেলিজেন্সের প্রতি আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, হযরত আলী,মিকদাদ এবং যুবাইরের মতো সাহাবিকে এই কাজের জন্য নিয়োগ এবং তৎক্ষণাৎ মক্কার অভিমুখে পাঠানো তার প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সাথে একজন বদরী সাহাবির প্রতি তার ইমোশানও চোখে পড়ার মতো। আবার এত বড় অপরাধ করার পরও বদরী সাহাবিদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনাকে মাথা পেতে নিয়ে এবং তার পূর্ববর্তী কাজের স্বীকৃতি হিসেবে রাসূল তাকে বেকসুর খালাস দিয়ে দেন। এখানে রাসূল ইন্টেলেকচুয়াল, ইমোশনাল এবং স্পিরিচুয়াল ইন্টেলিজেন্সের মিলিত প্রকাশ দেখিয়েছেন।

---

[২৪] সহীহুল বুখারী, ফদলু মান শাহেদা বদরান : ৩৯৮৩
[২৫] সূরা মুমতাহিনা-১

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের নেতিবাচকতা

"যেকোনো দক্ষতার মতো, মানুষকে বুঝতে এবং পড়তে পারার ক্ষমতাও একইসাথে ভাল বা মন্দের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে"- এডাম গ্র্যান্ট

নতুন নতুন গবেষণাগুলো আমাদের বলে, মানুষ যখন তাদের মানসিক দক্ষতাকে উন্নত করে, তখন তারা অন্যদের নিপুণভাবে পরিচালনা (Manipulate) করার ক্ষেত্রেও আরও চৌকশ হয়ে ওঠে। আপনি যখন নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন, আপনি তখন আপনার সত্যিকারের অনুভূতিগুলোকে মুখোশের আড়ালে ঢাকার কারুকার্য শিখে যাবেন। যখন আপনি জানেন যে, অন্যরা কী অনুভব করছে, কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, আপনি তাদের হৃদয়ের টানে টানতে পারেন এবং তাদের নিজেদেরকে নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের অন্ধকার দিকটি মানুষের মধ্যে ইমোশনাল ম্যানিপুলেশানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

এই ইমোশনাল ম্যানিপুলেশানের আচরণটি বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। কারো আত্মবিশ্বাস, আত্ম মূল্যায়ণ, আত্ম-দক্ষতাকে নিজের সাময়িক ফায়দা হাসিলের জন্য নষ্ট করে দেওয়াও এক ধরনের ইমোশনাল ম্যানিপুলেশান। অনেকসময় কারো ইগোকে জাগিয়ে দিয়ে তার মধ্যে অহংবোধের জন্ম দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধিও ইমোশনাল ম্যানিপুলেশানের মধ্যেই পড়বে। আবার কাউকে অতিরিক্ত প্রশংসা এবং তোষামোদ করে তার মধ্য থেকে নিজের গোপন স্বার্থ হাসিল করাও এ ধরনের ম্যানিপুলেশানের ক্যাটাগরিতে পড়ে।

একটি কোম্পানিতে এই ইমোশনাল ম্যানিপুলেশানের বিষয়টি এভাবে কাজ করে যে, মানুষ যখন আরেকজনের আবেগ অনুভূতি বুঝতে পারে এবং নিজের

আবেগ প্রকাশ এবং নিয়ন্ত্রনে দক্ষ হয়—তখন সে কৌশলী পদক্ষেপে যেকোনো পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত লাভ হাসিলের পাঁয়তারা করে।

গবেষকরা কিংবা বিজ্ঞানীরা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে অনেক কথা এবং গবেষণা প্রকাশ করলেও এর অন্ধকার দিকটি নিয়ে খুব একটা কাজ করেন না। আস্তে আস্তে যদিও এই ট্রেন্ড পরিবর্তন হচ্ছে এবং এখন অনেকে এর অন্ধকার দিক নিয়েও কথা বলা শুরু করেছেন।

সমাজ-বিজ্ঞানীরাও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের এই অন্ধকার দিকটি নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোচেন মেঙ্গেসের নেতৃত্বে একদল তরুণ উদীয়মান গবেষক দল দেখিয়েছেন, যখন একজন নেতা আবেগে ভরা একটি মোটিভেশনাল বক্তৃতা দেন, তখন শ্রোতাদের মূল বক্তব্যটি যাচাই করার সম্ভাবনা একদমই কম থাকে। বক্তব্যের বিষয়বস্তুও কম মনে রাখে তারা। শ্রোতারা বক্তৃতা দ্বারা এতটাই অনুপ্রাণিত হয় যে, বক্তৃতার সত্যমিথ্যার প্রতি খুব একটা মনোযোগ না দিয়ে বক্তৃতাটাই বেশি মনে রাখে।

আবেগের শক্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে এক গবেষক বিশ শতকের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার বডি ল্যাংগুয়েজের প্রভাবগুলি অধ্যয়ন করতে গিয়ে কয়েক বছর কাটিয়েছেন। তিনি হিটলারের হাতের অঙ্গভঙ্গি অনুশীলন করা এবং তার নড়াচড়ার চিত্র বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন—এই জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিটি একজন যাদুকরী গুণসম্পন্ন পাবলিক স্পিকার। তিনি বক্তব্যে অন্যদের মধ্যে এক যাদুকরী আবহের সৃষ্টি করতেন। আর এই গুণটি এমন এক বিষয় যা তিনি কঠোর সাধনা এবং অধ্যবসায় দ্বারা রপ্ত করতে পেরেছিলেন।

চৌকশ বুদ্ধিমত্তাবান ব্যক্তিরা তাদের চারপাশের লোকদের সম্পর্কে এতটাই সচেতন যে তারা অনেক সময় তাদের খারাপ আচরণগুলি সংশোধন করতে এমনকি বলতেও অনীহা বোধ করে। তারা জানে যে এমন কথা বলে তারা তাদের জনপ্রিয়তা হারাবে। এজন্য তারা এসব থেকে দূরে থাকে। একটা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের উর্ধতন কেউ যদি বেশি বুদ্ধিমত্তাগিরি দেখিয়ে তার অধীনস্তদের শুধরে না দেয়, তাহলে যথাযথ কর্মী তৈরি হবে না। এই যে "Bad guy" না হওয়ার প্রবণতা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের একটা অন্ধকার দিক।

অপরদিকে নবি রাসূলরা ছিলেন ভারসাম্যপূর্ণ ইন্টেলিজেন্সের অধিকারী। এই দুনিয়াতে নবিগণের আগমণের একটা মুখ্য মিশন হচ্ছে, সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা। 'কারো কাছে ভালো/খারাপ হব', এই বিবেচনায় নবি-রাসূলরা কখনো দাওয়াত দেন নাই। তারা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সৎকাজের

আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ করে গেছেন। কাউকে খুশি করা কিংবা দুঃখিত করা তাদের ধর্তব্যে ছিল না। স্থান, কাল, পাত্রভেদে দাওয়াতী বক্তব্য মানুষের মধ্যে কিরূপ প্রভাব ফেলবে এটা নিয়ে তারা সচেতন ছিলেন।